Actors in the World

[সিলেবাস: Modern State, types of state, sovereignty, non-state actors, relations between state and non-state actors]

অনুসরণীয়: এই অধ্যায় থেকে আসবেই ইংশাআল্লাহ॥ এই অধ্যায়ের টপিকসমূহের মধ্যে ৪৩তম তে ০৪টি, ৪১তম তে ০১টি, ৪০তম তে ১টি, ৩৮তম তে ৪টি, ৩৭তম তে ০১টি, ৩৬তম তে ০৩টি এবং ৩৫তম তে ০২টি প্রশ্ন এসেছে। এই পরিসংখ্যান থেকে প্রমাণিত যে, এখান থেকে প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক।

বিগত প্রশ্ন:

৪৩তম: নৈতিক রাষ্ট্রের ধারণাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

- **নৈতিক রাষ্ট্র (Moral State):**

যে রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নৈতিক আচরণ করে এবং ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই রাষ্ট্রই নৈতিক রাষ্ট্র। নৈতিক রাষ্ট্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বজনীন মূল্যবোধ চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। মানবাধিকারের প্রশ্নে, মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্নে, মানবতার প্রশ্নে কোনো শক্তি বা শত্রু-মিত্রের অবস্থানের দিকে না তাকিয়ে মানবতার পক্ষে অবস্থান নেওয়াই হচ্ছে নৈতিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

- **নৈতিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য:**
  ১. নৈতিক রাষ্ট্র রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা উভয়ই রক্ষা করে।
  ২. নৈতিক রাষ্ট্রে সাধারণ জনগণ সকলেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থাকবেন।
  ৩. মানবতার পক্ষে কাজ করে এমন শাসক থাকে নৈতিক রাষ্ট্রে।
  ৪. বৈশ্বিক রাজনৈতিক ব্লকে যেসব রাষ্ট্র নীতির মধ্যে থাকে সেসব রাষ্ট্রের পক্ষে থাকাই নৈতিক রাষ্ট্র।
  ৫. এই রাষ্ট্রে জনগণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে কার্যক্রম সম্পাদনে যথেষ্ট সুযোগ থাকবে।
  ৬. নৈতিক রাষ্ট্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সংবলিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকবে।
  ৭. নৈতিক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিধির প্রতি শ্রদ্ধাশীল।
- **উদাহরণ:** ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের বিরোধীতাকারী রাষ্ট্রসমূহ নৈতিক রাষ্ট্রের অন্যতম উদাহরণ।

৪৩তম: OIC-এর ভূমিকা কী? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহের সমস্যা মোকাবেলা করাসহ মুসলিম ধর্মীয় স্থানসমূহ শত্রুমুক্ত ও নিরাপদ করা এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Organization of Islamic Cooperation (OIC). ৫৭টি দেশের ১৬০ কোটি মুসলমানের অভিভাবক হলো ওআইসি।

- **OIC-এর ভূমিকা:**

  রাজনৈতিক ক্ষেত্রে:

  মুসলিম বিশ্বের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় ওআইসি রাজনৈতিকভাবে ভূমিকা রাখে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার মামলার উদ্যোক্ত ছিল ওআইসি।

  অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে:

  ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ওআইসিভুক্ত ৫৭টি মুসলিম দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ করে।

- **OIC-2025:**

  ওআইসি OIC-2025 নামে নতুন প্রোগ্রাম ঘোষণা করেছে। দারিদ্র্য বিমোচন, সন্ত্রাসবাদ দমন, বিনিয়োগ ও অর্থ, খাদ্য নিরাপত্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, নারীর ক্ষমতায়নসহ ১৮টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে OIC-2025.

  শিক্ষা ক্ষেত্রে:

  মুসলিম শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নিশ্চিত করা ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

- **সঠিক ভূমিকা পালনে ওআইসির ব্যর্থতা:**

  শিয়া-সুন্নি ও অর্থনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে বিরোধের কারণে মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ রক্ষা ব্যাহত হয়।

৪৩তম: আরব লিগ কী? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর: আলোচনা জরুরি নয়।

৪৩তম: বিশ্ব ব্যাংক কী? ব্যাখ্যা করুন।

বিশ্ব ব্যাংক একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা সংস্থা, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ ও অনুদান প্রদান করে। বিশ্ব ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক লক্ষ্য হল বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন। সারা বিশ্বের ১৮৯টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এর প্রধান সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে অবস্থিত।

- **বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:**
  দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপ আমেরিকাসহ উন্নত দেশগুলোতে দেখা দেয় মহামন্দা। বিশ্ব অর্থনীতির উল্লিখিত এই টানাপড়েনের লাগাম ধরতে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডস নামক স্থানে জাতিসংঘ মুদ্রা ও অর্থবিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে দুটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যথা: IBRD ও IMF.
- **বিশ্ব ব্যাংকের গঠন:** International Bank for Reconstruction and Development, IBRD এবং International Development Association, IDA নিয়ে বিশ্ব ব্যাংক গঠিত।
- **বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ:** বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সদস্য– ৫টি। যথা:
  ১. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
  মূল কাজ: বিশ্ব ব্যাংকের মূল কার্যক্রম IBRD পরিচালনা করে।
  ২. International Development Agency (IDA)
  মূল কাজ: উন্নয়নশীল বিশ্বে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান।
  ৩. International Finance Corporation (IFC)
  মূল কাজ: সদস্য দেশগুলোর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণদান করা।
  ৪. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
  মূল কাজ: স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে উন্নত দেশসমূহে যে বিনিয়োগ করে তার নিরাপত্তা প্রদান করা।
  ৫. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
  মূল কাজ: সরকার ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা ও নিষ্পত্তিতে সহায়তা করা।

৪১তম: নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে কী কী করতে হবে?

সরকার ২০৩১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। তাই ভিশন-২০৩১ বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, বাংলাদেশ ২০১৫ সালের ১ জুলাই বিশ্ব ব্যাংকের জরিপে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হয়।

- **নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উত্তরণে করণীয়–**
  ১. অর্থনৈতিক কাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে কার্যকর শিল্প, বাণিজ্য, রাজস্ব এবং মুদ্রানীতি নিশ্চিত করতে হবে।
  ২. আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।
  ৩. বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বর্তমানে বছরে ৩-৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হচ্ছে। অন্তত ১০-১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত জরুরি।
  ৪. ব্যাংকিং খাত শক্তিশালী করতে হবে। খেলাপি ঋণের হার ৯.৭%। এটি যথাসম্ভব ৪-৫% এর মধ্যে রাখতে হবে।
  ৫. ডাচ ডিজেজ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। বর্তমানে রপ্তানি আয়ের ৮৪% আসে পোশাক শিল্প থেকে। তাই রপ্তানি খাত বহুমুখী হওয়া জরুরি।
  ৬. Demographic Dividend বা জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগাতে হবে। ১৫-৬৪ বছরের মধ্যে বা কর্মক্ষম জনগণের (৬৬%) দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ৬ষ্ঠ বৃহত্তম দেশ।
  ৭. ধনী-গরিবের বৈষম্য দূর করতে হবে।
  ৮. আইসিটি খাতকে সহজ করতে হবে।
  ৯. বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে রেমিটেন্স। তাই রেমিট্যান্স প্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে হবে।
  ১০. কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে।

৪০তম: ভঙ্গুর রাষ্ট্র (fragile state) ও ব্যর্থ রাষ্ট্র (failed state) -এর মধ্যে পার্থক্য কী?

ভঙ্গুর রাষ্ট্র (fragile state):

২০১৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে fragile state এর ধারণার উদ্ভব হয়। ওয়াশিংটনভিত্তিক Fund for the Peace and Foreign Policy (FPFP) নামক একটি প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম failed state থেকে fragile state এর পার্থক্য করেছে। FPFP এর তথ্য মতে নিম্নোক্ত ১২টি সূচকে গড় ৩.২ এর নিচে সূচক মান থাকলে তাকে ভঙ্গুর রাষ্ট্র বলা যাবে। এখানে মোট সূচক মান ১২০। সূচকসমূহ–

ক. জনসংখ্যাগত চাপ	ঙ. উত্তেজনা ও সহিংসতা	ঝ. সরকারি সেবা
খ. উদ্বাস্তু হয়ে বিদেশ গমন	চ. ক্ষমতার দ্বন্দ্ব	ঞ. রাষ্ট্রের বৈধতা
গ. অভিবাসন ও মেধা পাচার	ছ. বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা	ট. নিপীড়ন
ঘ. দারিদ্র্য ও মন্দা	জ. অসম উন্নয়ন	ঠ. সহিংসতা

বিশ্ব ব্যাংকের Country Policy and Institutional Assessment - এর সূচক মান অনুযায়ী যদি কোনো দেশের সূচক মান ৩.২ এর নিচে হয় তাহলে সেই রাষ্ট্র ভঙ্গুর রাষ্ট্র। এছাড়াও–

১. IDA এর ঋণের উপর নির্ভশীল রাষ্ট্র এবং
২. অন্তত ৩ বছর শান্তিরক্ষী মিশনের উপর শৃঙ্খলা নির্ভর রাষ্ট্র ভঙ্গুর রাষ্ট্র।

উদাহরণ: ইয়েমেন, সিরিয়া।

ব্যর্থ রাষ্ট্র (Failed State):

'ব্যর্থ রাষ্ট্র' প্রত্যয়টির প্রথম ধারণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালে ট্রুম্যান নীতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ডলার কূটনীতি (dollar diplomacy) চালু করে। ডলার কূটনীতির মাধ্যমে যেসব দেশ মার্কিন সাহায্য নিয়েও ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি, সেসব দেশকে যুক্তরাষ্ট্র 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেছে। ২০০১ সালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সর্বপ্রথম ব্যর্থ রাষ্ট্রের ধারণা প্রদান করেন।
অর্থাৎ, 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' হলো এমন এক ধরনের রাষ্ট্র যারা উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে অর্থনৈতিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি পেয়েও নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি।

বুশ প্রশাসন অনুযায়ী ব্যর্থ রাষ্ট্রের উপাদান হলো–

১. সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সমর্থন দান ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা।
২. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংসের উৎস।
৩. মানবাধিকার লঙ্ঘন।
৪. অবৈধ অস্ত্র ও গণবিধ্বংসী অস্ত্র ।
৫. অবৈধ ও ব্যাপক চোরাচালানি বা মাদক ব্যবসার জন্য বিখ্যাত।

বৈশিষ্ট্য: এসব দেশ বৈদেশিক সাহায্য পাবার পরেও–

ক. অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টাতে পারেনি।	ঘ. রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল।
খ. নিজেদের GDP বাড়াতে পারেনি।	ঙ. কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছাড়াই দিনের পর দিন চলছে।
গ. জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে পারেনি।	চ. মানবাধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি পাশ্চাত্য 'ভ্যালু' বা 'মূল্য' অনুপস্থিত।

উদাহরণ: গ্রিস। ট্রুম্যান ডকট্রিনের ৪০ লাখ ডলার সাহায্য নিয়েও নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি।

৩৮তম: বহুজাতিক রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? [**]

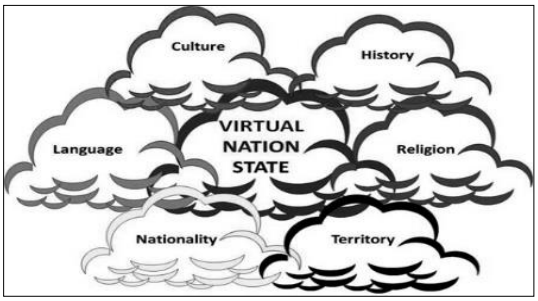

বহুজাতিক রাষ্ট্র হলো দুই বা ততোধিক জাতি বা রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত। এটি জাতিরাষ্ট্রের বিপরীত ধারণা। জাতি রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিপুল নাগরিকের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে, আর বহুজাতিক রাষ্ট্রের অনেকগুলোর জাতির সমন্বয়ে গঠিত হয়। ভাষা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, ধর্ম ও ঐতিহ্যগত মিল রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীকে জাতি বলে। যদি একটি দেশ বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এবং পরস্পর নিরাপত্তার জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনে আগ্রহী হয়, তাকে বহুজাতিক রাষ্ট্র বলে।

Alain Dieckhoff এর মতে.

"The term 'Multinational' state is often used to cover too wide a range of states."

সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্ব-শাসনের লক্ষ্যে বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্র একদিকে যেমন জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত, তেমনি তা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠী অন্যদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে বলে, তারা বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলে।

- **বৈশিষ্ট্য:**
  - ক. বহুজাতিক রাষ্ট্রে বহুধর্মের, বহুবর্ণের, বহুভাষার মানুষ বসবাস করে।
  - খ. এক ও অভিন্ন জাতীয়তাবোধে তারা উদ্বুদ্ধ।
  - গ. নৃ-তাত্ত্বিক জাতীয়তা অপেক্ষা রাজনৈতিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তা বিদ্যমান।
  - ঘ. রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত ও অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।
- **উদাহরণ:** আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত। ভারতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী মিলে একটি জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে।
- **বহুরাষ্ট্রিক জাতি (Multi-nation State):** একই সংস্কৃতির আওতায় অনেকগুলো দেশের জনগণকে একত্রে বহুরাষ্ট্রিক জাতি বা Multi-Nation State বলে। যেমন, জার্মান জাতি বলতে জার্মান ভাষায় কথা বলে এমন জাতিকে বুঝায়। সেক্ষেত্রে, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের জনগণকে বহুরাষ্ট্রিক জাতি বলে।

৩৮তম: 'ভূ-খণ্ড' এবং 'ভূ-খণ্ডগত অখণ্ডতা'র মধ্যে পার্থক্য কী?

ভূ-খণ্ড	ভূ-খণ্ডগত অখণ্ডতা
রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান।	জাতিগোষ্ঠী গঠনের অন্যতম উপাদান
রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড ভৌগোলিক দিক দিয়ে অখণ্ডিত বা দ্বিখণ্ডিত বা বহুখণ্ডিত হতে পারে।	ভূ-খণ্ডগত অখণ্ডতা হলো এই ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য।
ভূ-খণ্ড হলো রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে অবস্থিত স্থল, জল এবং আকাশসীমা।	ভূ-খণ্ডগত অখণ্ডতা হলো এই সীমার মধ্যে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক দিয়ে অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠা করা
যুদ্ধ বা সংঘর্ষের সময় ভূ-খণ্ড একই থাকে।	যুদ্ধ বা সংঘর্ষের সময় ভূ-খণ্ডগত অখণ্ডতা নাও থাকতে পারে

৩৮তম: উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

জাতিসংঘের Committee for Development Policy, CDP অনুসারে মাঝারি উন্নয়নের দেশই উন্নয়নশীল দেশ। এই কমিটির মতে নিম্ন মাথাপিছু আয়, নিম্ন গড় আয়ু ও অর্থনৈতিক বহমুখীকরণের অভাবের দেশগুলো স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশ। অপরদিকে, উচ্চ মাথাপিছু আয়, উচ্চ গড় আয়ু এবং অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণের পর্যাপ্ততা হলো উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য। আর এসব সূচকে যেসব দেশ মাঝারি মানের থাকে তারা উন্নয়নশীল দেশ।

জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সংস্থার (UNDP) হিসেবে, ঐ সমস্ত দেশগুলোকেই উন্নয়নশীল দেশ বলা যায় যেগুলো তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে উল্লেখযোগ্য হারে শিল্পখাতের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ সকল দেশের জীবনযাত্রার মান মাঝারি থেকে নিম্নমানের হয়ে থাকে।

Committee for Development Policy, CDP অনুসারে, দেশ ৩ ধরনের। যথা:

১. স্বল্পোন্নত দেশ/ Least Developed Countries (LDCs)
২. উন্নয়নশীল দেশ/ Developing Countries
৩. উন্নত দেশ/ Developed Countries

Committee for Development Policy, CDP অনুসারে উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য হতে পারে–

ক. মাথাপিছু আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।	ছ. শক্তি সম্পদের অভাব পূরণে ক্রমশ সক্ষমতা অর্জন করতে থাকে।
খ. গড় আয়ু ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।	জ. শিক্ষার হার ক্রমশ বাড়তে থাকে।
গ. জিডিপির ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি ঘটে।	ঝ. প্রযুক্তিগত উন্নতিতে সক্ষমতা অর্জন করে থাকে।
ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার থেকে কমতে থাকে।	ঞ. বিনিয়োগের সম্ভাবনা বাড়তে থাকে।
ঙ. বাণিজ্য ঘাটতি উচ্চ থাকলেও ক্রমশ কমতে থাকে।	ট. জিডিপিতে শিল্পের অবদান বাড়তে থাকে।
চ. কৃষির উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি থাকলেও ক্রমশ এই নির্ভরশীলতার হার কমতে থাকে।	

৩৮তম: আন্তর্জাতিক অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক (Non-state Actors) বলতে কী বুঝায়?

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে পড়ুন।

৩৭তম: রাষ্ট্র গঠনের উপাদান হিসাবে সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব কী? [***]

রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারার ক্ষমতাই সার্বভৌমত্ব। অন্য কোন রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার স্বাধীনতা ভোগ করার নামই সার্বভৌমত্ব।

রাষ্ট্র গঠনে সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব:

১. ১৬৪৮ সালের Peace of Westphalia তে বলা আছে, A state must be sovereign. অর্থাৎ, সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্র হতে পারে না। তাই, বলতে হবে রাষ্ট্র গঠন করতে হলে সার্বভৌমত্ব প্রয়োজন।
১. রাষ্ট্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অভ্যন্তরীণ ভূমি, সম্পদ ও জনগণের উপর রাষ্ট্রের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব থাকবে। যাকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অভ্যন্তরীণ রূপ বলা হয়।
২. সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক রূপ হলো একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে অন্য রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না।
৩. জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। আর জনগণের এ ইচ্ছার প্রতিফলন নিশ্চিত করে সার্বভৌমত্ব।
৪. সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্রীয় সীমানার সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় এবং রাষ্ট্রের অখণ্ডতা নিশ্চিত করা বা টিকিয়ে রাখা যায় না।
৫. সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্র সরকারের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে না। অর্থাৎ, নামসর্বস্ব সরকার থাকে মাত্র।
৬. সার্বভৌম ক্ষমতা মৌলিক ও চরম। রাষ্ট্রের ভিতরে ও বাইরে তার সমকক্ষ বা তার উর্ধ্বে কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না।
৭. সার্বভৌমত্বহীন রাষ্ট্রকে বলা হয় *de facto state.* তবে সার্বভৌমত্ব থাকলে বলা হয় *de jure state.*

উদাহরণ: সার্বভৌমত্ব আছে বলেই ২০১২ সাল থেকে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন State of Palestine নামে পরিচিত। ২০১২ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘ প্যালেস্টাইনকে '*de jure state.*' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ পর্যন্ত জাতিসংঘের ১৩৬টি দেশ পিএলও কে স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি দেয়।

৩৬তম ও ৩৫তম: জাতিতাত্ত্বিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? [**]

একই ভাষা, একই সংস্কৃতি, একই ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লালিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যখন একতাবদ্ধের উন্মেষ ঘটে তখনই সৃষ্টি হয় একটি জাতিসত্তার। আর এই জাতিসত্ত্বা থেকে রাজনৈতিকভাবে জাতিরাষ্ট্র গঠিত হয়। যেমন: বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতিসত্তার গঠন, আর বাঙালি জাতিসত্তা থেকে বাংলাদেশ নামক জাতিতাত্ত্বিক রাষ্ট্রের গঠন হয়।

জাতি বলতে বুঝায় ভাষা, ধর্ম, বংশগত উৎপত্তি ইত্যাদির কোন একটি ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, বংশ ইত্যাদির কোন একটির উপর ভিত্তি করে কোন জনগোষ্ঠী যখন স্বকীয় কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করে তখন তাকে জাতিরাষ্ট্র বলে। জাতিরাষ্ট্রের বিপরীতে রয়েছে বহুজাতিক রাষ্ট্র, নগর রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য, কনফেডারেশন ইত্যাদি। ইতালীয় দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলিকে জাতি রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করা হয়। তাঁর মতে, *"সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।"*

Devis-এর মতে,

"জাতি রাষ্ট্র হলো এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ একটি
সাধারণ পরিচিতি সম্পর্কে সচেতন ও একই সংস্কৃতি ধারণ করে"।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আধুনিক রাষ্ট্রমাত্রই হচ্ছে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র। কেননা, জাতীয়তার ভিত্তিতেই নির্ণিত হয় আজকের বিশ্বের নাগরিকদের পরিচয়। **উদাহরণ:** সৌদি আরব, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ প্রভৃতি।

৩৬তম: সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? [***]

সার্বভৌমত্ব (sovereignty) হলো রাষ্ট্রের সেই বিশেষত্ব, যার দরুন একটি রাষ্ট্র নিজের আওতাধীন সমগ্র এলাকার অভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সর্বেসর্বা হয় এবং অপর কোনো রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল থাকে না। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান।

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য:

সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের মালিকানা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন-বিধান প্রণয়ন এবং প্রয়োগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার নামই সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

১. **মৌলিক ক্ষমতা (Originality):** এটি এমন ক্ষমতা যার সমকক্ষ বা উর্ধ্বে কোনো শক্তি নেই।
২. **চরম ক্ষমতা (Absoluteness):** এটি নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন ক্ষমতা।
৩. **সর্বব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা (Universality & Comprehensiveness):** এ ক্ষমতা সার্বজনীন ও সমভাবে পরিব্যপ্ত।
৪. **স্থায়িত্ব (Permanance):** এ ক্ষমতা স্থায়ী ও অক্ষুণ্ন থাকে। রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে সার্বভৌমত্ব থাকা না থাকার উপর।
৫. **অ-বিভাজ্যতা (Indivisibility):** এটা এমন ক্ষমতা যা বিভক্ত করা যায় না।
৬. **অ-হস্তান্তরযোগ্য (Inalienability):** এমন ক্ষমতা যা হস্তান্তরযোগ্য নয়। এ ক্ষমতা বদল হওয়ারও যোগ্য নয়।
৭. **এককত্ব বা অনন্যতা (Exclusiveness):** এ ক্ষমতা একক ও অন্যন্য, যার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই।

বাস্তবতা:

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের মধ্যে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, সরকার ছিল। কিন্তু সার্বভৌমত্ব ছিল না। সার্বভৌমত্ব বলতে সেই চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে বুঝায়, যাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। রাষ্ট্রের ভেতরে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সেই ক্ষমতা মেনে চলে এবং না মানলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। যে শক্তি বিদেশের কোন নিয়ন্ত্রণ মানে না, সেটাই হল সার্বভৌম শক্তি।

৩৬তম: সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য কী?

যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, সংগঠিত সরকার, সার্বভৌম আধিপত্য এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টি রয়েছে, তাকে রাষ্ট্র বলে। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত মন্ত্রিসভাকে বলে সরকার। অনেক সময় রাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমষ্টিকে সরকার বলা হয়। তবে এই ৩টি বিভাগের কোনোটি এককভাবে সরকার নয়। বর্তমান বিশ্বে 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, এদের একটির অবর্তমানে অন্যটি অচল।

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য/ সম্পর্ক:

১. আগে রাষ্ট্র, পরে সরকার সৃষ্টি হয়।
২. রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা থাকে, সরকারের থাকে না
৩. রাষ্ট্রের মালিক জনগণ, সরকার হল রাষ্ট্রের মুখপাত্র।
৪. রাষ্ট্রের উপাদান ৪টি, সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান মাত্র।
৫. জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার প্রতিফলন সরকার।
৬. রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, সরকার সদা পরিবর্তনশীল।
৭. সকল রাষ্ট্র এক প্রকার, কিন্তু সরকার বিভিন্ন।
৮. রাষ্ট্র সকল নাগরিকের উৎস, কিন্তু সরকার তা নয়।
৯. রাষ্ট্র বিমূর্ত ধারণা, কিন্তু সরকার বাস্তব প্রতিষ্ঠান।
১০. রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য ও অন্যতম উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব, সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে সরকারের কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা নেই, সরকার মুখপাত্র হিসেবে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে মাত্র।

৩৫তম: সার্বভৌমত্ব (*Sovereignty*) ও সার্বভৌম সমতার মধ্যে তফাৎ কী? [**]

সার্বভৌমত্বঃ

নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারার ক্ষমতাকে সার্বভৌমত্ব বলে। এটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। সার্বভৌমত্বের ফলে রাষ্ট্র তার নিজের আওতাধীন সমগ্র এলাকার অভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবহারে সর্বেসর্বা হয় এবং অপর কোনো রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল থাকেনা। ১৬৪৮ সালের Peace of Westphalia এর মতে, "আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব একটি সর্বেসর্বা ও অপরিহার্য শক্তি"।

সার্বভৌম সমতাঃ

জাতিসংঘ সনদে ২(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সম অধিকারের বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে। এখানে বলা আছে, জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বের প্রত্যেক সার্বভৌম রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক সত্ত্বা হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্য হিসেবে সমমর্যাদা দ্বারা পরিচালিত। উদাহরণঃ UDHR-1948 অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উগান্ডার লোক একই মর্যাদার অধিকারী হবে।

তফাৎঃ

১. সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের একক, অবিভাজ্য, নিরঙ্কুশ ও অবাধ ক্ষমতাকেই বুঝায়। আর সার্বভৌম সমতা বলতে বুঝায় আন্তর্জাতিক আইনে প্রত্যেকটি সার্বভৌম রাষ্ট্র অন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমান অধিকার লাভ করবে।

২. সার্বভৌমত্বের বলে রাষ্ট্র তার অধীন জনসমষ্টি ও সকল সংস্থার আনুগত্য লাভ করে। আর সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল দেশের নাগরিক সমান অধিকার লাভ করে।

৩. সার্বভৌম ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে অন্য যেকোনো রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি, সন্ধি ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। আর সার্বভৌম সমতাবলে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি, বন্ধুত্ব স্থাপন ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় অংশগ্রহণের সমান অধিকার লাভ করে।

৪. সার্বভৌম ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরে আইন অমান্যকারীকে শাস্তি বা দণ্ড প্রদান করতে পারে। অন্যদিকে সার্বভৌম সমতার নীতিতে সরকার তার বাধ্যবাধকতা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে প্রয়োগ করবে।

বাস্তব প্রয়োগঃ

ধরা যাক, বাংলাদেশ আর ভারতের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এক্ষেত্রে দেখা যায়, সামরিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভারত শক্তিশালী। এখানে ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। কিন্তু যখন দুটি দেশ ক্রিকেট খেলবে তখন উভয় দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রশ্ন অবান্তর হবে। বরং উভয় দেশের খেলায় জয়লাভের সমান সুযোগ থাকবে। এখানে এটাই সার্বভৌম সমতা।

৩৫তমঃ বহুজাতিক সংস্থার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন: [**]

বহুজাতিক সংস্থা বলতে এমন সংস্থা বা কোম্পানিকে বুঝায় যেটি কোন একটি দেশে নিবন্ধিত থাকে এবং বিভিন্ন দেশে তার ব্যবসা ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বহুজাতিক সংস্থা যে সমস্ত দেশে কাজ করে সে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও প্রকৃতপক্ষে এর বেশি অংশ আসে কোম্পানির উৎস দেশ থেকে। যেমন- ইউনিলিভার, কোকাকোলা, পেপসি, জেনারেল মটরস, ফিলিপস ইত্যাদি। নিম্নে বহুজাতিক সংস্থার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলোঃ

১. বিভিন্ন দেশের বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমনঃ ফেসবুক।
২. দুর্বল প্রতিযোগীদের বাজার থেকে হটায়।
৩. রাজনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।
৪. বিভিন্ন দেশে কারখানা স্থাপন করে।
৫. বহুজাতিক সংস্থায় সংরক্ষণবাদ অকার্যকর হয়।
৬. সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কার্যক্রম চালায়।
৭. বহুজাতিক সংস্থা পেশাগতভাবে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক নিয়োগ দেয়।
৮. বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর শাখা বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত। তবে শাখাগুলো কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়।
৯. বহুজাতিক কোম্পানির মূলধন অনেক বড় আকারের। কিছু কিছু বহুজাতিক কোম্পানির লেনদেনের পরিমাণ অনেক উন্নয়নশীল দেশের বার্ষিক বাজেটের চেয়েও বেশি।
১০. বহুজাতিক সংস্থার উৎপত্তি ঘটে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে।
১১.

সিলেবাস অনুযায়ী এই অধ্যায়ের বিষয়সমূহ

➢ রাষ্ট্র (State) [**]

রাষ্ট্র বলতে এমন এক রাজনৈতিক সংগঠনকে বোঝায় যা কোনো একটি ভৌগোলিক এলাকা ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের নিয়ন্ত্রণ করার সার্বভৌম ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র অবশ্যই একটি সার্বভৌম (Soverign) ভূ-খণ্ড। রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

Aristotle বলেন,

"রাষ্ট্র হল স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সংশোধিত কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি।"

অধ্যাপক Hall এর মতে,

"রাষ্ট্র হল এমন এক জনসমষ্টি যা নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত।"

উইলসন বলেন,

"নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে আইনগতভাবে সংগঠিত জনসমষ্টিই রাষ্ট্র"।

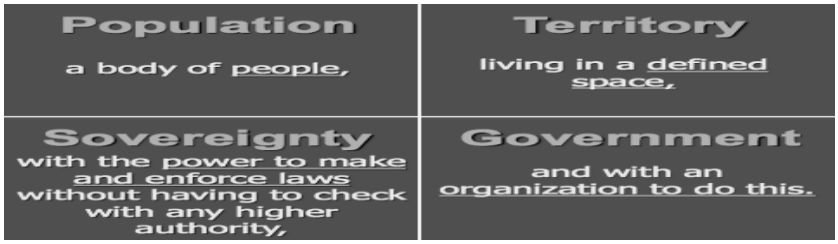

১৬৪৮ সালের Peace of Westphalia মতে,

"রাষ্ট্র হলো The highest political Association এবং একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত জনসমষ্টি।"

রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের প্রাথমিক বিষয়বস্তু। রাষ্ট্রের একক কোন সংজ্ঞা নেই। তাই আন্তর্জাতিক আইন কখনো রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস চালায় নি। কিন্তু ১৯৩৩ সালের Montevideo Convention এর Article-1-এ রাষ্ট্রের কিছু অধিকার ও দায়িত্ব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনে ব্যক্তি হিসেবে রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ থাকতে হবে-

ক. মূখ্য উপাদানঃ	খ. গৌণ উপাদানঃ
১. স্থায়ী জনসমষ্টি (ঐক্যবদ্ধ জাতি)	১. স্থায়িত্ব
২. নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড (আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত)	২. আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
৩. সরকার (সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ)	৩. জাতীয়তাবাদ
৪. সার্বভৌমত্ব (রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা)	৪. অধিকার ও সাম্য
	৫. সম্পর্ক স্থাপনের স্বাধীনতা (চুক্তি ও সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত)

➢ মুখ্য উপাদানসমূহ: [***]

১. স্থায়ী জনগোষ্ঠী:

প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য যৌক্তিক সংখ্যার জনগোষ্ঠী প্রয়োজন যারা ঐ দেশের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকবে। এখানে কখনো ভাসমান জনসংখ্যা থাকতে পারবে না। অভিবাসী থাকতে পারবে তবে তাদের এ দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। যেমন- ইসরাইলের স্থায়ী জনসংখ্যা যেকোন জীবিত ইহুদিকে বুঝায় সে পৃথিবীর যেখানেই বাস করুক না কেন।

২. নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড:

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড থাকা বাঞ্চনীয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃকগ্রহণযোগ্য ভূখণ্ড বা সীমানা হলো নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃতি অবশ্যই দরকার। কারণ এই স্বীকৃতি ছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা নিয়ে নানা রকম বিরোধ দেখা দিতে পারে।

৩. সরকার:

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছে সরকার, যা সর্বময় ক্ষমতা পরিচালনা করে থাকে এবং রাষ্ট্রের উপর কার্যকরী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। সরকারের যে অপরিহার্য উপাদান তা পূরণকল্পে একটি সরকারকে অবশ্যই কার্যকরী বা effective সরকার হতে হবে। অর্থাৎ সরকারের কার্যকারিতা রয়েছে কিনা সেটাই মূল বিষয়।

৪. সার্বভৌমত্ব:

কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব থাকলেই তারা চুক্তি করতে পারে, অধিকার সৃষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক দায় বহন করতে সক্ষম হয়। এরূপ রাষ্ট্রের উপর অন্য কোন রাষ্ট্র কোন ব্যাপারেই কোন ধরনের কর্তৃত্ব করতে পারে না। এটি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা।

☞ **রাষ্ট্রের সীমা:**

আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত অঞ্চল হবে রাষ্ট্রের সীমা। দুটি রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী ভিত্তিরেখা (০ রেখা) থেকে ১৫০ গজ পর্যন্ত অঞ্চল No man's land হিসেবে বিবেচিত হয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, ভিত্তি রেখা থেকে ১৫০ গজের মধ্যে কোনো প্রকার স্থাপনা নির্মাণ অবৈধ। এছাড়াও, ভূমি থেকে ১০০ কিলোমিটার বা ৬২ মাইল এলাকা রাষ্ট্রের আকাশসীমা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

☞ **কার্যত স্বীকৃতি (De-facto recognition)**

'কার্যত স্বীকৃতি' অস্থায়ী প্রকৃতির স্বীকৃতি। জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যত স্বীকৃতি বা De-facto recognition দেওয়া হয়। কোন রাষ্ট্র বা সরকারকে পুরোপুরি স্বীকার না করলেও তার বাস্তবতাকে অস্বীকার না করা। কার্যত স্বীকৃতি সাধারণত সীমিতভাবে দেয়া হয়।

➢ আধুনিক রাষ্ট্র (Modern State)

১৯৭৫ সালে চীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই আধুনিকীকরণের চারটি নীতি স্থাপন করেন। সে অনুযায়ী চারটি ক্ষেত্রে আধুনিক এমন রাষ্ট্রকে আধুনিক রাষ্ট্র বলে ঃ

১. **শিল্প:** শিল্পে উন্নত এমন রাষ্ট্রকে আধুনিক রাষ্ট্র বলা যায়।
২. **কৃষি:** কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম এমন রাষ্ট্রকেও আধুনিক রাষ্ট্র বলা যায়।
৩. **সামরিক:** সামরিক ক্ষেত্রে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার ও প্রশিক্ষিত সামরিক সদস্য আছে এমন দেশও হবে আধুনিক রাষ্ট্র।
৪. **বিজ্ঞান প্রযুক্তি:** একটি দেশ স্বনির্ভর হতে পারবে কিনা তা অনেকটা নির্ভর করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নতির আলোকে।

অপরদিকে, Christopher Pierson তাঁর ২০০৪ সালে প্রকাশিত The Modern Stateগ্রন্থে আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা দেন। তিনি বলেন,
"জনগণের প্রয়োজনে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন। জনগণ চায় তাদের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যুর নিবন্ধন হোক, তাদের সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিক, রাষ্ট্র বৃদ্ধ বয়সে জনগণকে পেনশন দিক, বহিঃস্থ আক্রমণ থেকে রাষ্ট্র জনগণকে রক্ষা করুক, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা হোক, যৌক্তিক আইন বিদ্যমান থাকুক প্রভৃতি। আর সেই প্রয়োজন থেকেই উদ্ভব হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রের।"

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি:

ক. **সার্বভৌমত্ব রক্ষা:** দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আধুনিক রাষ্ট্রের পবিত্র ও নৈতিক দায়িত্ব।
খ. **প্রশাসন পরিচালনা:** দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ।
গ. **অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা:** অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে।
ঘ. **বিচার সংক্রান্ত:** আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। এজন্য রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গঠন ও পরিচালনা করতে হবে।
ঙ. **নিরাপত্তা সংক্রান্ত:** জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য।
চ. **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত:** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও সংরক্ষণ করা আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম অপরিহার্য কাজ।
ছ. **আইন প্রণয়ন:** প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইন বাতিল, সংশোধন ও পরিবর্ধন করা রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ।
জ. **আর্থিক কাজ:** খাজনা ও কর নির্ধারণ, তা আদায় করা এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বার্ষিক বাজেট তৈরি ও পেশ করবে।

উদাহরণ: জার্মানি, কানাডা, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি।

বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র (Types of State)

➢ Swing State [***]

সুইং স্টেট হল সেই সমস্ত মধ্যমানের শক্তিধর রাষ্ট্র যারা ২ সুপার পাওয়ারের মধ্যে আনুগত্য ও এক ধরনের ভারসাম্য রেখে চলে। এসব দেশ নিজেদের স্বার্থে একাধিক সুপারপাওয়ারকে ব্যবহার করে এবং উভয়পক্ষ থেকেই সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে। একইভাবে সুপারপাওয়ারগুলোও চায় নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে এই সব সুইং স্টেট তার পক্ষে থাকুক।

বর্তমান বিশ্বে সুইং স্টেটের উদাহরণ হচ্ছে: ভারত, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও চীন চায় এ ৬টি দেশ তাদের সমর্থন করুক। এ ৬টি দেশ বা সুইং স্টেটের গুরুত্ব এতই বেশি যে শক্তিধর দেশগুলো সুইং স্টেটকে বাদ দিয়ে পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারত নিজেকে চীনের হুমকি থেকে রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে Quad-এ অংশগ্রহণ করছে, একইসাথে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক আগ্রাসন থেকে বাঁচতে এবং নিজেদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে চীনের সাথে BRICS-এ অংশগ্রহণ করছে।

পুলিশি রাষ্ট্র (Police State)

পুলিশি রাষ্ট্র বলতে এমন একটি রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিক সমাজ এবং তাদের স্বাধীনতার উপর চরম নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে। পুলিশি রাষ্ট্রে সরকার ক্ষমতা ধরে রাখার অভিলাষে পুলিশের ক্ষমতার যথেচ্ছ অপব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন এবং নাগরিক স্বাধীনতার উপর উচ্চমাত্রায় দমনমূলক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। পুলিশি রাষ্ট্রে পুলিশ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার পরিবর্তে বা তার পাশাপাশি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। বর্তমানে মিয়ানমার এবং উত্তর কোরিয়ার মতো আধুনিক কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থাকে পুলিশি রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

পুলিশি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

১. একটি পুলিশি রাষ্ট্রে কর্তৃত্ববাদী, সর্বগ্রাসী বা অ-উদারনৈতিক শাসনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। পুলিশি রাষ্ট্রের সরকারগুলো সাধারণত একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে, তবে পুলিশি রাষ্ট্র বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থায়ও আবির্ভূত হতে পারে।
২. বলপ্রয়োগ করা পুলিশি রাষ্ট্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।
৩. রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহার হতে হতে পুলিশ তাদের প্রকৃত দায়িত্ব এবং কাজগুলো পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে।
৪. এ ধরনের রাষ্ট্রে পুলিশের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতি কর্তৃত্বপ্রবণতা।
৫. জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোনো নিশ্চয়তা নেই।
৬. পুলিশ নাগরিকদের সেবা করার পরিবর্তে রাষ্ট্রের সেবা করে।
৭. আইন সব মানুষের জন্য ধারাবাহিকভাবে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় না
৮. নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রয়োগ এবং ক্ষমতায় থাকাদের জবাবদিহিতার অভাব দেখা যায়
৯. বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য ন্যায়বিচারের অসম মান
১০. সোশ্যাল মিডিয়া, টিভি, রেডিও, সংবাদপত্রে বা ওয়েবসাইটে লোকেরা কী বলে তা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

➢ তৃতীয় বিশ্ব (Third World):

এস ই ফাইনারের মতে,

"সেই সব রাষ্ট্রকে তৃতীয় বিশ্বভুক্ত বলা হয় যারা পুরোপুরি সর্ব নিয়ন্ত্রণবাদী বা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক নয়।"

Franz Fanon তার "The Wretched of the Earth" গ্রন্থে Third World বা তৃতীয় বিশ্বের ধারণা দেন। তিনি তৃতীয় বিশ্বের **বৈশিষ্ট্যে** বলেন–

ক. দেশটি চলতি বিশ্বে অর্থনীতি ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল।
খ. রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল।
গ. বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে।
ঘ. উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক নয়।
ঙ. বৈদেশিক তদারকি মেনে চলে।

উদাহরণঃ দক্ষিণ সুদান, মালি।

➢ চতুর্থ বিশ্ব (Fourth World):

নিজস্ব স্বকীয়তাহীন রাষ্ট্রই চতুর্থ বিশ্ব। চতুর্থ বিশ্ব ধারণাটির উদ্ভব হয় ১৯৭৪ সালে কানাডার তরুণ কূটনৈতিক Mbuto Milando এবং George Manuel এর গবেষণায়। Mbuto Milando বলেন,

"When native peoples come into their own, on the basis of their own cultures and traditions, that will be the fourth world".

এর অর্থ দাঁড়ায়, রাষ্ট্রহীন গরিব ও প্রান্তিক জনগণের দেশই চতুর্থ বিশ্ব।

George Manuel তাঁর *The Fourth World: An Indian Reality (1974)* নিবন্ধে অ-শিল্পের দরিদ্র দেশকেই চতুর্থ বিশ্ব বলেছেন।

➢ **বৈশিষ্ট্যঃ**

i. চতুর্থ বিশ্ব বৈশ্বিক সমাজের বাইরে অবস্থান করে।	vi. বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ নির্ভর অর্থনীতি।
ii. রাখাল, যাযাবর ও কৃষিকাজ জীবিকার প্রধান উৎস থাকে।	vii. কাঁচামালের অপ্রাচুর্যতা।
iii. দারিদ্র্যের উচ্চহার বিরাজ করে।	viii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান।
iv. মাথাপিছু আয় স্থির/ স্থবির থাকে।	ix. নিম্ন গড় আয়ু।
v. শিক্ষার হার ক্রমহ্রাসমান বা স্থির থাকে।	**x.** আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বাইরে থাকে। প্রভৃতি।

উদাহরণঃ সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান

➢ সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র (Buffer State) [***]

দুটি সংঘর্ষপ্রবণ রাষ্ট্রের মাঝে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত দুর্বল, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন রাষ্ট্রটিকে সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র (Buffer State) বলে। সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয়ান কৌশলগত ও কূটনৈতিক ধারণা (১৬৪৮ সালের Peace of Westphalia) থেকে উদ্ভব হয় সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্রের ধারণার।

দুটি বৃহৎ অথচ বিপরীতমনা রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, যা সংঘর্ষে জড়িয়ে যেতে রাষ্ট্র দুটোকে নিবৃত্ত করে, তাকে বাফার স্টেট বলে। দুটি বৃহৎ শক্তিশালী দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে অনেক সময় বিশেষভাবে সাহায্য করে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক Palmer & Perkins বলেছেন,

> "দ্বিমুখী শক্তিসম্পন্ন বিশ্বে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো একে অপরের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে আসে, সেখানে সংঘর্ষ নিবারক অঞ্চল ও নিরপেক্ষ এলাকা ব্যতীত শক্তিসাম্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক"।

বৈশিষ্ট্য:

১. সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্রটির পার্শ্ববর্তী দুটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হবে।
২. পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ সংঘাতময় হবে।
৩. রাষ্ট্রটি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের বিরোধের সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখবে।
৪. রাষ্ট্রটি অবশ্যই স্বাধীন হবে।
৫. পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্বল থাকবে।
৬. শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় রাষ্ট্রটি ভূমিকা রাখে।
৭. কখনো কখনো এটি উপগ্রহ রাষ্ট্রের (Satellite State) মত আচরণের শিকার হয়।

উদাহরণ: ২টি বিশ্বযুদ্ধের (১ম ও ২য়) সময় সংঘাতময় জার্মানি ও ফ্রান্সের মাঝে বেলজিয়াম, দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মাঝে প্যারাগুয়ে ছিল Buffer State এবং ভারত ও চীনের মাঝে ভুটান Buffer State.

➢ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State): [***]

সাধারণত জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণকারী রাষ্ট্রই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হয়। সমাজবিজ্ঞানী T H Marshal তাঁর ১৯৪৯ সালের Citizenship and Social Class নামক এক নিবন্ধে গণতন্ত্র, কল্যাণ ও পুঁজিবাদের ধারণার আলোকে আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের বর্ণনা করেছেন।

বৈশিষ্ট্য:

১. জনগণের মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে।
২. ধনী জনগণ অগ্রসরমান কর (progressive tax) প্রদান করে। এতে ধনী-গরিবের বৈষম্য দূর হয়।
৩. এই রাষ্ট্রটি মিশ্র অর্থনীতি অনুসরণ করে থাকে।
৪. বিদেশি আক্রমণ থেকে রাষ্ট্র তার জনগণকে রক্ষা করে।
৫. আইন শৃঙ্খলা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে।
৬. জনগণ ও সরকারের মধ্যে যৌথ সরকারি চুক্তি থাকবে।

উদাহরণ: কানাডা, নিউজিল্যান্ড, বেলজিয়াম, নর্ডিক দেশসমূহ।

➢ উপগ্রহ রাষ্ট্র (Satellite State) [**]

একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রভাবে থাকা দুর্বল রাষ্ট্রটিকে উপগ্রহ রাষ্ট্র বা Satellite State বলে। এটি নব্য-উপনিবেশ বা Puppet State হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রটি ইতোমধ্যে স্বাধীন তবে অন্য একটি বৃহৎ/শক্তিশালী রাষ্ট্রের দ্বারা অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের শিকার।

গ্রহকে কেন্দ্র করে যেমন উপগ্রহ ঘোরে, তেমনি শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রভাবে থাকা দুর্বল/ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কোনো রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হলে ঐ রাষ্ট্রটিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের উপগ্রহ রাষ্ট্র বা Satellite State বলা হয়।

উদাহরণ: স্নায়ুযুদ্ধকালে ওয়ারশ প্যাক্ট (warsaw pact) ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে উপগ্রহ রাষ্ট্রের মত বিবেচিত হয়। স্নায়ুযুদ্ধকালে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় উপগ্রহ রাষ্ট্রের ধারণাটি। বর্তমানে ভারতের কাছে ভুটান, সৌদির কাছে বাহরাইন উপগ্রহ রাষ্ট্র।

➢ দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র (Rogue State):

দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র বলতে সেসব দেশকে বোঝানো হয়, যেসব দেশ–

- কর্তৃত্ববাদী বা একনায়কতান্ত্রিক সরকার দ্বারা শাসিত।
- মানবাধিকারকে কঠোরভাবে সীমিত করে।
- সন্ত্রাসবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করে।
- গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার করতে চায়।
- আন্তর্জাতিক রীতি নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।
- প্রচলিত আইন কানুন মানতে চায় না।

সর্বপ্রথম ১৯৯৪ সালে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অ্যান্থনি লেক পাঁচটি দেশকে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দেশগুলো হচ্ছে- উত্তর কোরিয়া, কিউবা, ইরান, লিবিয়া এবং ইরাক। এদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের ভাষায় "Axis of Evil" বলে।

➢ ডি ফ্যাক্টো রাষ্ট্র (de facto state):

স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র কিন্তু সার্বভৌমত্ব নাই এমন ভূ-খণ্ডকে de facto রাষ্ট্র বলে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র হিসেবে জনসমষ্টি, সরকার, ভূ-খণ্ড, সম্পদের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, চলাচলের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের সকল আনুষ্ঠানিকতা আছে শুধু সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর নলের মুখে থাকতে হয় এমন ভূ-খণ্ডই ডি ফ্যাক্টো রাষ্ট্র। আপাতদৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বহীন রাষ্ট্রই ডি ফ্যাক্টো রাষ্ট্র।

উদাহরণ: তাইওয়ান, তিব্বত, হংকং।

প্রকাশ থাকে যে, সার্বভৌমত্ব ও স্বীকৃতি আছে এমন রাষ্ট্রকে de jure state বলে। যেমন– দক্ষিণ সুদান।

➢ গভীর রাষ্ট্র (Deep state): [**]

ডিপ স্টেট বলতে বোঝায় কিছু সরকারি কর্মচারী সরকারি নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রচলিত যে রীতিনীতি তার বাইরে গিয়ে সরকারি নীতিতে প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করেন। 'ডিপ স্টেট' কোনো একক ব্যক্তি নন, বরং প্রভাবশালী বেশ কয়েকজন উর্ধ্বতন ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি চক্রকে বোঝায়, যারা নীতি প্রণয়নে ও গ্রহণে প্রভাব খাটায় বা খাটানোর চেষ্টা করে। 'ডিপ স্টেট' এর বিষয়টি প্রথমবারের মতো ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়। দেখা গেছে কিছু উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা, গোয়েন্দা কর্মকর্তা, প্রশাসনিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সরকারি দলিল ফাঁস করে চলমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করেছেন।

উদাহরণ: পাকিস্তান ও মিয়ানমারকে গভীর রাষ্ট্র বলা যায়। কেননা, এ দুটি দেশের সেনাবাহিনী সেদেশের সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে থাকে।

➢ দক্ষিণের রাষ্ট্র (South state): [***]

সাধারণত দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলো দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে। তাই সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা রাষ্ট্রসমূহকে দক্ষিণের দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দক্ষিণের দেশের বৈশিষ্ট্য:

১. প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা থাকলেও উত্তোলনের সক্ষমতা নেই।
২. দীর্ঘদিন পশ্চিমা উপনিবেশের অধীনে থাকায় সম্পদের বেশিরভাগই পাচার হয়ে গেছে।
৩. বিশেষ স্থায়ী অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি।
৪. প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল।
৫. পণ্যের বাজার প্রভু রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়।
৬. বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণনির্ভর অর্থনীতি।

উদাহরণ: সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান

বিঃ দ্রঃ Empirical অংশ থেকে Global South পড়বেন।।

➢ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র (Small state): [***]

সামরিক শক্তিতে দুর্বল রাষ্ট্রটিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলে। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রের অন্যান্য উপাদান বিশেষ করে আয়তন, অবস্থান, অর্থনীতি বা প্রকৃতি মুখ্য নয়। এখানে সামরিক শক্তিহীনতাই মুখ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন,

> "ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে ঐ রাষ্ট্রটিকে বোঝায় যার যুদ্ধের সামর্থ্য খুবই কম এবং গতানুগতিক। এটা কেবল বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তুলনা নয় বরং আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তিগুলোর তুলনায়ও হতে পারে।"

বৈশিষ্ট্য:

১. সামরিক শক্তিতে দুর্বল রাষ্ট্র
২. অন্য রাষ্ট্রের সামরিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল
৩. আয়তন, জনসংখ্যা বা অর্থনীতিতে দুর্বলতা বা শক্তিশালী হওয়ার অপরিহার্যতা নয়।

উদাহরণ: আইসল্যান্ড দেশটি আয়তনে মোটামুটি বড় হলেও সামরিক বাহিনী না থাকার কারণে তাকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলা যায়। অপরদিকে, ইসরাইল রাষ্ট্রটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও সামরিক শক্তি থাকার কারণে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলা যাবে না।

➢ বৃহৎ রাষ্ট্র (Big state):

সামরিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রটিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় বৃহৎ রাষ্ট্র বলে। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রের অন্যান্য উপাদান বিশেষ করে আয়তন, অবস্থান, অর্থনীতি বা প্রকৃতি মুখ্য নয়। এখানে সামরিক শক্তিই মুখ্য।

যেমন, উত্তর কোরিয়া বা সিরিয়া দেশ দুটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও সামরিক শক্তি থাকার কারণে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় বৃহৎ রাষ্ট্র।

➢ Annex-I & AOSIS: [***]

Annex-1	AOSIS
▪ OECD এর তথ্য মতে, শিল্পপ্রধান দেশকে বলা হয়- Annex-1. ▪ মোট ৪৩টি দেশ ও EU [সূত্র: OECD.ong] কে বলা হয়: অ্যানেক্স-১ ▪ এসব দেশ কার্বন নিঃসরণ করে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটায়। ▪ ২০০৯ সালের কোপেনহেগেন সম্মেলনে (COP-15) বলা হয়, ANNEX-1 দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ করার কারণে জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার এমন দেশগুলোকে তাদের জিডিপির ০.৭% ক্ষতিপূরণ দিবে। ▪ চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, ব্রাজিল (BASIC) COP-15 এর শর্তের বিরোধিতা করে।	▪ পূর্ণরূপ– Allaince of the Small Island States. ▪ পরিচয়– দ্বীপ ও উপকূলীয় দেশের জোট ▪ এসব দেশ পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার হয়ে বছরে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ▪ জাতিসংঘের প্রস্তাবনায় ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ▪ এর সদস্য ৩৯টি স্বাধীন দেশ এবং ৫টি পর্যবেক্ষক। ▪ এরা ANNEX-1 থেকে তাদের জিডিপির ০.৭% ক্ষতিপূরণ পাবে। ▪ এই সংস্থার সদর দপ্তর– নিউইয়র্ক

➢ স্বল্পোন্নত দেশ (LDCs): [***]

১৯৬৪ সালে বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে UNCTAD ৭৭টি দেশ নিয়ে G-77 গঠন করে। এই দেশগুলোর মধ্যে যেসব দেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে তাদেরকে নিয়ে ১৯৭১ সালে LDC Group তৈরি করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, G-77 ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যারা অর্থনীতিতে অগ্রসরমান তাদের নিয়ে গঠিত হয় G-24 এবং বাণিজ্যে পিছিয়ে থাকা দেশগুলো নিয়ে ECOSOC 1971 সালে LDCs গঠন করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৭৬৮ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী (UNGA 2768 Regulation) গঠিত হয় LDCs. বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে LDC ভুক্ত হয়।

LDC ভুক্ত হওয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন শর্তসমূহ:

i. মাথাপিছু GDP ৯০০ ডলারের নিচে হবে।
ii. গড় আয়ু ৫০ বছরের নিচে হতে হবে।
iii. অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণের অভাব থাকবে।

LDC ভুক্ত দেশ সুবিধা পায়:

i. GSP সুবিধা
ii. Soft Loan সুবিধা
iii. Copyright সুবিধা

LDC-মুক্ত হওয়ার শর্তসমূহ:

i. সর্বশেষ ৩ বছরের গড় মাথাপিছু আয় ১২৩০ ডলারের উপরে হতে হবে।
ii. অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার সূচক মান ৩২ এর নিচে হতে হবে।
iii. মানব উন্নয়ন সূচকের মান ৬৬ এর উপরে হতে হবে। *[উৎস: ECOSOC এর ২০১৮ ও ২০২১ সালের CDP Report]*

➢ Rump state [***]

একটি বৃহৎ রাষ্ট্র কোনো কারণে ভেঙ্গে গেলে এর টিকে থাকা ক্ষুদ্র মূল অংশকে Rump state বলা হয়। একটি বৃহৎ রাষ্ট্র বিপর্যয়, আগ্রাসন, সামরিক দখলদারিত্ব, বিচ্ছিন্নতা বা সরকারকে উৎখাত করার কারণে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বিঘ্নিত হওয়ার পরে সীমিত ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অধিকারী এক সময়ের বৃহত্তর রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাকে Rump State বলে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে উসমানীয় সাম্রাজ্য একটি Rump state এ পরিণত হয়েছিল, যখন ব্রিটেন এবং ফ্রান্স তার অঞ্চলগুলোকে League of Nations ম্যান্ডেটের আলোকে বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত করেছিল। বর্তমানে ইউক্রেনকে Rump state বলা যায়।

➢ কলা প্রজাতন্ত্র (Banana Republic)

রাজনৈতিকভাবে ভঙ্গুর রাষ্ট্রকে কলা প্রজাতন্ত্র বলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই শব্দটি রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল বিশেষত কলার মতো একমাত্র রপ্তানি পণ্যের উপর নির্ভরশীল মধ্য আমেরিকার দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
ইংরেজি অক্সফোর্ড শব্দকোষ অনুসারে কলা প্রজাতন্ত্র হলো,

> "অর্থনীতি বিদেশি পুঁজি নিয়ন্ত্রিত একটি একক রপ্তানি পণ্যের উপর
> নির্ভরশীল হওয়ার কারণে রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল একটি একক রাষ্ট্র।"

ফরাসি লেখক লে ব্লগ বুকোরনাইন বলেন,

> "কলা প্রজাতন্ত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানকেই সম্মান করা হয় না, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোন অনুক্রম মানা হয় না, এবং আইনের প্রতি কোন সম্মান এমনকি কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ স্তরেও দেখানো হয় না।"

বৈশিষ্ট্য:

১. ব্যাপক দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার
২. অত্যাচারী সরকার
৩. অস্থিতিশীল সরকার
৪. নাগরিক অশান্তি
৫. ঘন ঘন অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ও অভ্যুত্থান
৬. সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ রপ্তানির উপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা
৭. অবকাঠামো বিদেশি মালিকানাধীন ও স্বার্থ দ্বারা সমর্থিত
৮. বিদেশি বিনিয়োগ বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর সামগ্রিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা
৯. ব্যাপক দারিদ্র
১০. শাসক শ্রেণি এবং শাসিত শ্রেণির মধ্যে বিশাল ব্যবধান

উদাহরণ: তিউনিসিয়া।

➢ রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকের মধ্যে পার্থক্য: [***]

রাষ্ট্রীয় কর্মক (State Actors)	*অরাষ্ট্রীয় কর্মক (Non state Actors)*
রাষ্ট্রের বা সরকারের পক্ষে কাজ করে এমন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় রাষ্ট্রীয় কর্মক।	রাষ্ট্র বা সরকারের কাজ বা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় অরাষ্ট্রীয় কর্মক।
উদাহরণ: সরকারপ্রধান, গোয়েন্দা সংস্থা, কূটনৈতিক, মিলিটারি, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, সাহায্য সংস্থা, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সাহায্য সংস্থা প্রভৃতি।	**উদাহরণ:** INGOs, Organizations, MNCs, TNCs, Pressure Groups, Civil Society, Terrorist Groups, Press, Bill Gates, Pope প্রভৃতি।
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা ও বৈধতা আছে। ধরুন, অর্থমন্ত্রণালয়ের বাজেট করার সক্ষমতা ও বৈধতা দুটোই আছে।	সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বৈধতা না থাকলেও বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা রয়েছে। ধরুন, অর্থমন্ত্রণালয়ের বাজেট করার সক্ষমতা ও বৈধতা দুটোই আছে। কিন্তু CPD' র বাজেট করার সক্ষমতা থাকলেও বৈধতা নাই।
রাষ্ট্রীয় কর্মক অরাষ্ট্রীয় কর্মককে ব্যবহার করে থাকে। যেমন, পাকিস্তানের মিলিটারি ভারতের বিরুদ্ধে লস্কর-ই-তাইয়্যেবাকে ব্যবহার করে থাকে।	রাষ্ট্রীয় কর্মককে অরাষ্ট্রীয় কর্মক চাপ সৃষ্টি করে। যেমন, নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়ায় অবরোধ আরোপ করে চাপ সৃষ্টি করে।
অরাষ্ট্রীয় কর্মককে লালন ও নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, পরিবেশ মন্ত্রণালয় কোনো সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বেসরকারি পরিবেশ সংস্থার সাথে আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।	রাষ্ট্রীয় কর্মককে নির্দেশনা ও চাপসৃষ্টি করে। যেমন, বিশ্ব সম্প্রদায় থেকে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তের জন্য সাহায্য প্রাপ্তিতে সরকারকে সহযোগিতা করে থাকে বেসরকারি পরিবেশ সংস্থাসমূহ।

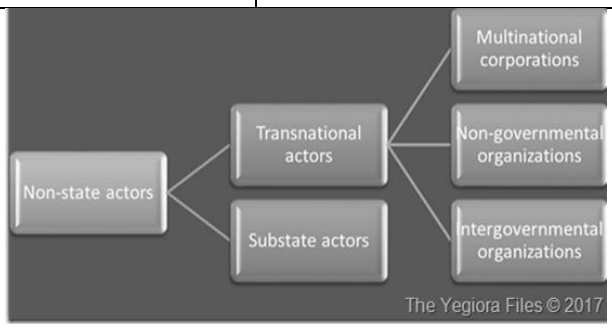

➢ State actor & Non- state actor এর মধ্যে সম্পর্ক:

ক. চাপ সৃষ্টি:

রাষ্ট্রীয় কর্মকের (state actors) কর্মকাণ্ডে অরাষ্ট্রীয় কর্মকগুলো রাষ্ট্রের স্বার্থ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কারণে সুন্দরবনে পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিবে বলে অরাষ্ট্রীয় কর্মক গণমাধ্যম, পরিবেশ সংগঠনসমূহ রাষ্ট্রকে চাপসৃষ্টি করে থাকে।

খ. রাষ্ট্রের তথ্য ফাঁস:

অরাষ্ট্রীয় কর্মকগুলো বিভিন্ন জরিপ ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের তথ্য ফাঁস করে থাকে। যেমন, টিআইবি যখন পুলিশের দুর্নীতির চিত্রের জরিপ প্রকাশ করে তখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পুলিশের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিদেশি সরকার ও সংস্থা তথ্য পেয়ে যায়।

গ. প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তথ্য লাভ:

রাষ্ট্র প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানার জন্য অরাষ্ট্রীয় কর্মকের উপর দৃষ্টিপাত করে। যেমন- বাংলাদেশের বাজেটের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে তথ্য লাভ করার জন্য Center for Policy Dialogue (CPD)- এর বাজেট সম্পর্কে জরিপ পর্যালোচনা করে থাকে।

ঘ. নির্দেশনা:

অনেক সময় রাষ্ট্রীয় কর্মক অরাষ্ট্রীয় কর্মকের কাছ থেকে নির্দেশনা নিয়ে থাকে। যেমন, পরিবেশ সম্পর্কে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মত সমান কাজ করতে BAPA, BELA, BEN বা পরশ নামের সংস্থাগুলো। আমরা দেখতে পাই যে, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত কপ-২৬ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে গেছেন। কেননা, অরাষ্ট্রীয় পরিবেশ সংস্থাগুলো পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য, উপাত্ত, নির্দেশনা দিয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে সহায়তা করতে পারে।

অর্থাৎ, অরাষ্ট্রীয় কর্মকের সাথে রাষ্ট্রীয় কর্মকের সম্পর্ক প্রয়োজনীয় ও নিবিড়।

Non- state actors

➢ MNCs vs TNCs: [***]

Multinational Comapanies / Corporations	***Transnational Companies/ Corporations***
একাধিক দেশে উৎপাদন, বিপণন ও কার্যক্রম চালাচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠান।	একাধিক দেশে উৎপাদন, বিপণন ও কার্যক্রম চালাতে সহায়তা করে থাকে।
স্ব স্ব দেশের শ্রমিক থাকে।	প্রেরিত রাষ্ট্রের শ্রমিক থাকে।
ভোগ ও সেবাখাতে বেশি জড়িত থাকে।	অবকাঠামো, জ্বালানি ও উন্নয়ন খাতে বেশি নিয়োজিত থাকে।
শুধু কেন্দ্র নয় বরং শাখা অফিস থেকেও কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।	শুধু প্রধান কার্যালয় বা কেন্দ্র থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে।
মুক্ত বাণিজ্য স্বরূপ হিসেবে কাজ করে।	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নব্য উপনিবেশবাদের স্বরূপ হিসেবে কাজ করে
উদাহরণ: স্যামসাং, প্রাণ, মাইক্রোসফ্ট প্রভৃতি।	**উদাহরণ:** গ্যাজপ্রম, চায়না মেজর ব্রিজ কোম্পানি প্রভৃতি।

➢ PGII প্রকল্প: [*]

- **পূর্ণ নাম:** Partnership for Global Infrastructure and Investment (Belt and Road Initiative এর বিকল্প)
- **উদ্দেশ্য:** উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর উপর চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকানো)
- **প্রস্তাবক:** জো বাইডেন
- **বিষয়বস্তু:** এ উদ্যোগ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান বাড়ানো, লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং ডিজিটাল অবকাঠামো তৈরি ত্বরান্বিত করবে। চীনের উচ্চাভিলাষী বিআরআইয়ের পাল্টা উদ্যোগ হিসেবে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, প্রত্যেকে এই পরিকল্পনার সুফল পাবে। তিনি বলেন,

"আমি বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই। এটা সাহায্য বা দাতব্য কিছু নয়। এটা হলো বিনিয়োগ। এতে প্রত্যেকে উপকৃত হবে। এই প্রকল্প গণতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে অংশীদার দেশগুলোকে সুনির্দিষ্ট সুফল পাওয়ার সুযোগ করে দেবে।"

ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেইন বলেন,

"সর্বশেষ এই প্রকল্পের লক্ষ্য বিশ্বের কাছে একটি ইতিবাচক শক্তিশালী বিনিয়োগ প্রণোদনা উপস্থাপন করা। এতে উন্নয়নশীল বিশ্বে আমাদের অংশীদারদের দেখানো যাবে যে তাদের জন্য একটি বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে।"

- **প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দিক:**-
  - প্রকল্পের প্রস্তাবিত তহবিল- ৬০ হাজার কোটি ডলার
  - যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুত তহবিল- ২০ হাজার কোটি ডলার
  - ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিশ্রুত তহবিল-২৫ হাজার ৭০০ কোটি ডলার
  - তহবিল সংগ্রহের সময় কাল- ৫ বছর

➢ চিপ- ৪ (CHIP- 4) জোট: [**]

যুক্তরাষ্ট্র, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান এই ৪টি দেশ বিশ্বের বেশিরভাগ সেমিকনডাক্টর চিপ তৈরি করে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দেশগুলোকে নিয়ে একটি জোট গড়তে উদ্যোগী হন, যার উদ্দেশ্য আমদানিনির্ভরতা কমানো ও চীনের প্রভাব খর্ব করা। এ সংক্রান্ত নতুন একটি আইনে স্বাক্ষর করে কয়েকশ কোটি ডলার প্রণোদনার ঘোষণা দেন বাইডেন। পাশাপাশি চিপ উৎপাদক বৃহৎ অপর তিন দেশ তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানকে নিয়ে CHIP- 4 প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। যদিও এই উদ্যোগ এখনো আলোচনার পর্যায়েই আছে।

➢ থ্রি জিরো এজেন্ডা (3ZERO Agenda):

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ টেকসই উন্নয়নের জন্য Agenda-2030 গ্রহণ করে। জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি' বিশ্বব্যাপী শান্তি, সমৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তারসহ একটি কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।

SDG অর্জন করতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোকে সকলের কাছে বোধগম্য করতে ৩টি সংস্থা- ACTED, Convergences এবং Gawad Kalinga- ৩জিরো উদ্যোগ (3Zero initiative) শুরু করেছে। এ উদ্যোগ একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চায় যার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো–

১. অসমতা এবং বৈষম্যের অবসান ২. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ৩. চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ।

3ZERO শব্দবন্ধ দ্বারা প্রকাশ করা হয় Zero Exclusion, Zero Carbon এবং Zero Poverty.

➢ ওপেক প্লাস (OPEC PLUS): [***]

OPEC ও তেলসমৃদ্ধ আরো ১০টি রাষ্ট্র নিয়ে OPEC PLUS গঠিত হয়। ২০১৬ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সম্মেলনের মাধ্যমে ওপেক প্লাস গঠিত হয়।

সদস্য: রাশিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, ব্রুনাই, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, ওমান, সুদান ও দক্ষিণ সুদান।

তেলের মূল্য স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে এবং দেশগুলোর মধ্যে তেল উৎপাদনের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে এই জোট গঠিত হয়। তারপর থেকে গ্রুপটি বিশ্বব্যাপী তেলের দামের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় স্বেচ্ছায় উৎপাদন হ্রাস করেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ চুক্তির অংশ নয়। এছাড়া চীন বা অন্যান্য নেতৃস্থানীয় পশ্চিমা উৎপাদনকারীরা **যেমন:** যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং নরওয়েও ওপেক প্লাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

➢ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল [**]

IMF সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে। সহযোগিতার উদ্দেশ্য–

ক. ঋণ নেয়া দেশগুলোকে `Balance of Payment' এর বৃত্ত থেকে বের করে নিয়ে আসা।

খ. ঋণ নেয়া দেশগুলো যাতে `Defaulter' হতে না পারে।

গ. বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে নেয়া ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

আইএমএফ একইসাথে উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থিক নীতি উন্নত করতে পারে। সাধারণত একজন ইউরোপিয়ান নাগরিক IMF এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। IMF এর ঋণ পেতে গ্রহীতা দেশগুলোতে কিছু শর্ত পালন করতে হয়। যেমন- Structural Adjustment Program.

IMF 'বোর্ড অব গভর্নরস' দ্বারা পরিচালিত হয়। ২৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাহী পরিষদ রয়েছে, যারা সংস্থাটি পরিচালনা করে। ৮টি দেশ একজন করে নির্বাহী পরিচালক মনোনীত করে। এই দেশগুলো হচ্ছে– যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও সৌদি আরব। বাকি ১৬ জন পরিচালক ৪ থেকে ২২ দেশের মধ্যে থেকে নিয়োগ দেয়া হয়। সাধারণত ধনী দেশগুলোরই আইএমএফ-এ বেশি কর্তৃত্ব থাকে। একজন ইউরোপিয়ান নাগরিককে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হিসেবে সব সময় বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে সমালোচিত হয়েছে। বিশেষ করে ব্রিকসভুক্ত দেশগুলো এর সমালোচনা করেছিল।

➲ IMF এর ঋণদান পদ্ধতি: [***]

নির্দিষ্ট পরিমাণ কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী সদস্যদেশগুলো প্রতিবছর তাদের জন্য নির্ধারিত শতকরা ২৫% হতে শুরু করে ২০০% পর্যন্ত অন্যদেশের মুদ্রা তহবিল হতে গ্রহণ করতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশে ভূমিকা:

১. উদার আমদানি নীতি
২. ব্যাংক ঋণের কঠোর নিয়ন্ত্রণ
৩. ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের হার বৃদ্ধি
৪. কর ব্যবস্থা সংগতিশীল করা
৫. কৃষি ও খাদ্য শস্যের উপর থেকে ক্রমান্বয়ে ভর্তুকি কমানো

৬. বিভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থার বিলোপ
৭. সামাজিক ও কল্যাণমুখী খাতের সংস্কার
৮. রপ্তানিমুখী শিল্প উদ্যোগ ও আর্থিক ক্রয়ক্ষমতা

➢ SDR [**]:

Special Drawing Right বা বিশেষ উত্তোলন অধিকার হলো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রাগুলোর একটি এলিট ক্লাব। ১৯৬৯ থেকে IMF এর নিয়ন্ত্রণে একটি আন্তর্জাতিক ফান্ড SDR নামে গঠিত হয়। SDR সূচকমান অনুসরণ করে অর্থ ও রিজার্ভ জমার বিনিময়ে সদস্যদেশ ঋণ গ্রহণ করতে পারে এবং যেকোনো সময় অংশীদার উত্তোলন করতে পারে। SDR সূচকে সদস্য সব দেশের সম্মতি থাকে। আইএমএফ এই সূচকমান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বর্তমান SDR সূচক মান ১.৩৬।

এসডিআর(SDR) হল একটি আন্তর্জাতিক রিজার্ভ অ্যাসেট। ১৯৬৯ সালে IMF দ্বারা সদস্য দেশগুলোর অফিসিয়াল রিজার্ভের পরিপূরক করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। মূলত আন্তর্জাতিক তারল্য সমস্যা সহজ করার জন্য SDR তৈরি করা হয়েছিল। SDR কে Paper gold বলা হয়।

SDR এর প্রচলন:

ষাট দশকের মধ্যভাগে ডলার সংকট তীব্র আকার ধারণ করলে ব্রেটন উডস্ পদ্ধতি আন্তর্জাতিক তারল্য রক্ষায় অচল হয়ে পড়ে। এর প্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত IMF এর বার্ষিক সম্মেলনে সদস্য দেশগুলো এ সংকট নিরসনে আলোচনা শুরু করে। দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৬৯ সালে SDR পদ্ধতি চালুর জন্য ঐক্যমতে পৌছে। প্রাথমিক অবস্থায় এক একক SDR কে এক একক ডলারের সমান ধরা হয়। ১৯৭১ এবং ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ২ বার ডলারের অবমূল্যায়ন করে। ফলে এক একক SDR পরে ১.৩৬ ডলারের সমান ধরা হয়। ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ১৬টি প্রতিনিধিত্বমূলক মুদ্রা বিবেচনা করে এদের গুরুত্ব সূচক গড়কে এক একক SDR এর মূল্য হিসাবে নির্ধারণ করে।

SDR-এর মান নির্ধারণ কারি মুদ্রা:

বর্তমানে SDR-এর মান ৫টি মুদ্রার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। SDR এর এলিট ক্লাবের মুদ্রাসমূহ-

১. ডলার– মজুতের হার ৪১.৭৩%
২. ইউরো– মজুতের হার ৩০.৯৩%
৩. রেনমিনবি (ইউয়ান-চীন)– মজুতের হার ১০.৯২%
৪. ইয়েন– মজুতের হার-৮.৩৩%
৫. পাউন্ড– মজুতের হার ৮.৯%

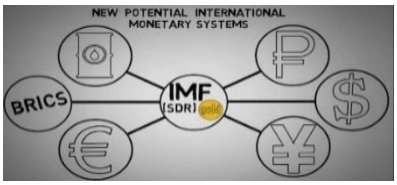

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ইউয়ানকে রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় আইএমএফের নির্বাহী পর্ষদ; যা ২০১৬ সালের ১ অক্টোবরে কার্যকর হয়।

উপর্যুক্ত মুদ্রাগুলোর মধ্যে বেশি লেনদেন হয়– ডলারে (৪২%)। এর পর ইউরোতে ৩১% এবং তারপরে ইউয়ানে ১১% লেনদেন হয়ে থাকে।

➢ SAP [**]:

Structured Adjustment Program বা কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি হলো আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ঋণদান নীতিমালা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এই কর্মসূচি চালু করে ১৯৬৯ সালে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো ঋণ পাবার জন্য SAP কর্মসূচি অনুসরণ করে। বর্তমানে মুদ্রা তহবিলের পাশাপাশি বিশ্ব ব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাও SAP কর্মসূচি চালু করেছে। এছাড়াও বেসরকারিভাবে অনেক ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থাও SAP কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

SAP-এর উপাদানসমূহ	SAP- এর উদ্দেশ্য
ক) বেসরকারিকরণ	ক. উৎপাদনকে রপ্তানিমুখী করা
খ) সরকারি বাজেটে ঘাটতি হ্রাস	খ. ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন
গ) সরকারের অর্থনৈতিক বা নীতিমালাকে দৃঢ় করা	গ. রাজনৈতিক ভাবধারা ইতিবাচক করা
ঘ) কঠোর মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন।	ঘ. কর্মীদের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়া
ঙ) মুদ্রার অবমূল্যায়ন	ঙ. নতুন অর্থনৈতিক ও পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এ ধরনের পরিস্থিতি হতে পারে– ভর্তুকি
চ) ভর্তুকি কমানো	

ছ) মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বাতিল জ) মজুরি কমানো ঝ) বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা।	কমানো, শুল্ক হ্রাস, ভোক্তার চাহিদার পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও কাঁচামালসহ বিভিন্ন উপকরণের দামের পরিবর্তন।